গণতন্ত্র — ভাবনা ও দুর্ভাবনা জনৈক দলছুট কম্যুনিস্টের চোখে

গৌতম সেন

আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ধারণা হিসাবে এবং রাজনৈতিক অনুশীলন হিসাবে সবচেয়ে স্বীকৃত ও মান্যতাপ্রাপ্ত পরিভাষা হল গণতন্ত্র। কয়েক শতকের দীর্ঘ সংগ্রামের পর মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে, হাতে-গোনা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সকল দেশের শাসকেরা এই গণতন্ত্রকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতই খর্ব ও অমান্য করুক না কেন — কথায়, লেখায়, ঘোষণায় স্বীকৃতি দেয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও প্রয়োগ করে। আর সেই গণতান্ত্রিক শাসনকে মান্যতা দিতে এবং তার বৈধতা পেতে শাসকেরা সদা সচেষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপকতর জনগণের কাছে এই গণতন্ত্র মর্যাদার জায়গা গ্রহণ করেছে এবং তার যে কোনো হানি উদ্বেগ ও প্রতিবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এই গণতন্ত্রের উদ্ভবের ঐতিহাসিক ন্যায্যতা, তার টিকে থাকার যৌক্তিকতা এবং তার একপেশে প্রয়োগের ব্যাকরণ বোঝার চেষ্টা না করে কম্যুনিস্টদের সুবিশাল অধিকাংশ একটি পুঁজিবাদী সমাজে বিদ্যমান গণতন্ত্রকে এমন নেতিবাচক অনুশীলন হিসাবে উপস্থাপিত করেন যেন সমাজ বদলের চূড়ান্ত লড়াইয়ে তা কম্যুনিস্টদের কাছে ত্রাত্য ও পরিহারযোগ্য। পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের উৎক্রমণশীল পর্বে তাদের প্রিয় ও পছন্দের ব্যবস্থা হল সর্বহারার একনায়কত্ব — যে একনায়কত্বে গণতন্ত্রের ভাবনা বা অনুশীলন যা শুধু ক্ষতিকর নয়, বিলাসিতা। তাই এই সমস্ত কম্যুনিস্টদের কাছে জনপ্রিয় মত হল — গণতন্ত্র হল বুর্জোয়া প্রতারণা ও ফাঁদ; আর একনায়কত্ব (অবশ্যই 'সর্বহারা একনায়কত্ব') হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাণভোমরা। ভাবটা এরকম — 'গণতন্ত্র' থাক বুর্জোয়াদের স্বার্থে, আর সর্বহারাদের পক্ষে থাক 'একনায়কত্ব'।

গণতন্ত্র বিষয়ে যান্ত্রিক ও একপেশে মনোভাবের পরিবর্তে কথায় ও কাজে গণতন্ত্রের ধারণা ও অনুশীলন নিয়ে আমাদের প্রতি-সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে হবে; আর গণতন্ত্র নিয়ে এই গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে আমাদের পথ কেটে বেরোতে হবে। একদিকে, গণতন্ত্রের শক্তি ও উপযোগিতা, অন্যদিকে তার সীমাবদ্ধতা ও প্রতারণা নিয়ে নতুন করে চর্চা করেই আমাদের চলার পথে উত্তরণ ঘটাতে হবে। এই লক্ষ্যেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করাটা যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, এটাকে বুর্জোয়াদের পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের ফল হিসাবে বিচার করাটা হবে ভ্রান্ত ও অনৈতিহাসিক। আরও ভুল হবে যদি এই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অগ্রপদক্ষেপ হিসাবে মান্যতা দিতে আমরা অস্বীকার করি। ইতিহাসের যে কোনো অনুসন্ধিৎসু ছাত্র মাত্রই জানেন যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নানা সংস্করণের মধ্য দিয়ে শুধু যে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে, সোস্যাল এস্টেট প্রথার অবসান হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের কবরে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়েছে, তা-ই নয়, তা রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তম্ভে — আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, বিচারবিভাগ সর্বত্র তা এমন এক বৈপ্লবিক গণতন্ত্রীকরণ ঘটিয়েছে, যার ফলে সেখানে প্রবেশাধিকারের নীলরক্ত সহ পূর্বতন সম্ভ্রান্ততার সব ধরণের রক্ষাকবচের বিলোপসাধন ঘটেছে, অন্তত খাতায়-কলমে এবং সম্ভাবনা অর্থে তার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট ব্যবস্থার পত্তন এবং তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হিসেবে গড়ে তোলা এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। আমরা এও জানি এসবের প্রতিটি পদক্ষেপ বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল অংশের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের লড়াই ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডি হল — বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল অংশ ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি, বিপ্লবী ঝঞ্ঝায় ভীরু বুর্জোয়া শ্রেণির মাতব্বরদের বিরোধিতা ও দোদুল্যমানতা সহ-ই এই যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঐতিহাসিকভাবে জয়যুক্ত হল, সেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ওপর বুর্জোয়া শ্রেণি ঐতিহাসিকভাবেই তার আধিপত্যের ছাপ এঁকে দিল — পরোক্ষ অথচ নিশ্চিন্তে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র একই সঙ্গে হয়ে উঠল বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্ব। আজকের এই পুনর্চর্চার সন্ধিক্ষণে সেই সামাজিক রসায়নটি আর একবার যাচাই ও ঝালাই করে নেওয়া যাক।

এটা ঘটনা যে পুলিশ-সেনা, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগের মতো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি নির্বাচন বা অন্য কোনোরকম গণ নিয়ন্ত্রণ ও কৈফিয়ত যোগ্যতার বাইরে থাকলেও সেগুলির এমনভাবে গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে, সেগুলি পুঁজি ও বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থই দেখবে, এমন কোনো প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা নেই। তাত্ত্বিক ও সম্ভাবনা অর্থে দেখলে সাধারণ নাগরিকদের, এমনকি সর্বহারা শ্রেণির ঘরের ছেলেমেয়েদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ থাকছে (প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ তা বাস্তবে ঘটেও থাকে)। সেদিক থেকে দেখলে, দাস-সমাজে বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেভাবে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষভাবে শাসক হওয়ার, তা অরিরাম পুনরুৎপাদিত হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকত, আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই শোষিত ও শাসিত জনগণের মানসে এই যে ধারণাটা উৎপন্ন হয়ে চলেছে যে, 'দেশটা আমরাই চালাচ্ছি,' তা কোনো অলীক বা জোর করে চাপানো ধারণা নয়, এর মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে। তবে, বাকি অংশটা মিথ্যা ও প্রতারণায় ভরা এবং গণতন্ত্র নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয়।

প্রথমত, যে তথাকথিত মেধা ও প্রতিযোগিতার দৌড়ে উত্তীর্ণ হয়ে ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে হয়, তাতে গরিবরা যে সব সময়ে বিশ্রীরকমভাবে পিছিয়ে থাকে, এটা সকলেরই জানা। যত উঁচু পদ, চান্স পাওয়ার পথ তত টাকার থলিতে কণ্টকাকীর্ণ। প্রবেশাধিকার পাবার পর, ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে গেলে তাকে পুঁজিবাদী স্থিতাবস্থার এবং বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। যেমনভাবে বলা হল, তেমন স্থূলভাবে তাদের পরীক্ষা দিতে হয় না, নির্দিষ্ট কোনো পরীক্ষা হলেও তাদের বসতে হয় না; তবে পরীক্ষাটা চলে সূক্ষ্মভাবে, জীবনচর্চার অঙ্গ হিসাবে। আর সফল হতে না পারলে ছিটকে যেতে হয়। যাঁরা ওপরের দিকে উঠে যান, ততদিনে তাঁরা বুর্জোয়া স্থিতাবস্থার দক্ষ ধারকবাহক হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়ত, এই ওপরে-ওঠার একটা সহজ ফলাফল আছে। ওই উচ্চপদে াসীন ব্যক্তিগণ নানা সুযোগসুবিধা সহ যে উচ্চ বেতনের অধিকারী হন, তা যেমন সাধারণ মানুষজনের বহু গুণ বেশি, তেমনই তা নিজেদের জীবনধারণের, সন্তানসন্ততি রক্ষণ ও পালনের খরচ থেকে অনেক অনেক বেশি। ফলে তারা যে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, তাতে জনগণের সঙ্গে তাদের একটা প্রবল বিচ্ছিন্নতা ঘটে। তার ওপর ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়কে তারা খাটান বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনতে। নিজেরা চালু অর্থে পুঁজিপতি না হয়েও, পুঁজিপতিদের সঙ্গে এক ক্লাবে খানাপিনা করেন, বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন, পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা পোষণ করেন। এইভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ও স্বচ্ছন্দে তাঁরা শুধু পুঁজিপতিদের সেবাদাসে পরিণত হন না, তার সম্প্রসারিত অংশে পরিণত হন।

কিন্তু, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, বিশেষত পার্লামেন্টারিয়ান প্রজাতন্ত্রে সেনাবাহিনী-আমলাতন্ত্র বা বিচারকরা সর্বোচ্চ বা স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী নয়। এই পার্লামেন্ট শুধু মন্ত্রীসভা গঠন করে না; বিভিন্ন মন্ত্রকে পদাধিকারী, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারক সহ বিচারকবৃন্দ এবং সেনাকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম-রীতির সীমানার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার হাতেই ন্যস্ত থাকে। তাই রাজনৈতিক বিজ্ঞানের ভাষ্যে দেশ শাসনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হল পার্লামেন্ট, যেটি আবার সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত। খাতায়-কলমে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেমন আইন পাল্টাতে পারে, তেমনই সংবিধান সংশোধনও করতে পারে। সুতরাং একদিক থেকে বলা ও ভাবা যেতে পারে, জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই ব্যবস্থাটা যত রীতিসিদ্ধ হোক না কেন, যত আদর্শস্থানীয় হোক না কেন, এমন বহু ক্ষেত্র দেখা গেছে, যেখানে পার্লামেন্ট তার 'সীমা অতিক্রম করে', তখন পার্লামেন্টের ক্ষমতা পঙ্গু করতে অথবা নিষ্ক্রিয় করতে সেনাবাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং কখনো কখনো নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেয়। (এই কর্মকাণ্ড এইভাবে হাতেনাতে দেখিয়ে দেয় কেন বলা হয়, 'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'!) জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, এই পরগাছা সর্বশক্তিমান বাহিনীর অস্তিত্বই গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও সুচারু প্রয়োগের পক্ষে চিরস্থায়ী বিপদ ও ভয়ানক বিপজ্জনক। যাইহোক, একটি পুঁজিবাদী দেশে প্রাধান্যকারী ও আধিপত্যকারী মডেল হিসাবে আমরা যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করি, তা কেন জনগণের শাসন না হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন হয়ে ওঠে, আমরা এবার সেই রহস্যে প্রবেশ করব।

এ-কথা ঠিক, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যে পার্লামেন্টটা গঠিত হয়, তা জনগণের ভোটের মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়। তবু, প্রতিবারই তা গণবিরুদ্ধ মঞ্চের, বুর্জোয়া মঞ্চের চরিত্র অর্জন করে। সেটা এই কারণে হয় না যে, রিগিং বা ভোটে কারচুপি হয় (ওদের নিজেদের মধ্যেকার হার-জিৎ ঠিক করতে তা তো কম-বেশি হয়ই!) অথবা বন্দুক উঁচিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হয় (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তা একদম যে হয় না, তাও নয়।); বরং ওদের বহু বিজ্ঞাপিত অবাধ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনেও (এবং নির্বাচনেই) একই ফলাফল হয়। কেননা, সেই মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এমন নিয়ম, সেখানে অংশ গ্রহণের এমন কায়দাকানুন যে জনগণের বিরোধীপক্ষরাই সব সময়ে জিতে যায়। প্রথমত, নীচু থেকে আলাপ-আলোচনা, বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থাভাজনতারা কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জনস্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হন না। এঁরা ভোটে প্রার্থী হন ওপর থেকে দলের মনোনীত হয়ে। প্রার্থী হবার পর এঁরা ভোট চাইতে ময়দানে নেমে পড়েন। আর তারই অঙ্গ হিসাবে নিজের সপক্ষে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধে নেমে পড়েন, যে প্রচারের অন্যতম দিক হল জনগণকে সেবা করার বিরাট ফিরিস্তি আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থী সম্বন্ধে কুৎসা। একই সঙ্গে চলে রোড শো, বিজ্ঞাপনী চমক, কখনও বা তারকা সমাবেশ। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা গণ সংগ্রাম থেকে উত্থিত প্রার্থী নন, তাই ভোট পেতে, মানে জোগাড় করতে এঁদের এত বাহানা করতে হয়, এত আয়োজন করতে হয়। আর এসব সফল করতে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। ভোট শেষে ফলাফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় — কী নির্দিষ্ট আসনে, কী সব মিলিয়ে ওদের একটা পক্ষ জিতেছে, অন্য পক্ষরা হেরেছে; জেতা দূরের কথা, গরিব শোষিত পক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগই পায়নি; যদিও-বা পেয়ে থাকে, সম্মানজনক ভোট পেতে ব্যর্থ হয়েছে। (লড়াই বিকাশের একটা মাত্রায় ভিন্ন রকমের ফলাফল হতে পারে, আমরা আলোচনা করছি সাধারণ পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে।) এই প্রসঙ্গে একটা খোলামেলা গোপন কথা পুনরাবৃত্তি করা দরকার। নির্বাচনী দৌড়ে যারা টাকা ঢালে, তারা দান-খয়রাতি করতে অথবা জনসেবার তাগিদে তা করে না। এটাও তাদের বিনিয়োগ, যেখানে মুনাফা নিশ্চিত। যেই জিতুক, যেই হারুক, নির্বাচন শেষে তারা সুদে-আসলে টাকাটা উসুল করে নেয়। দেশে দেশে মন্ত্রী-আমলা-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মধ্যেকার বিরাট বিরাট দুর্নীতি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

চলতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্য আর একটি বিরাট খামতি নিয়ে চর্চা করা যেতে পারে। ভোটের সময়ে গণতন্ত্রের মাধুর্য নিয়ে এত হইচই করা হয়, যেন মনে হয়, ভোটটা গণতন্ত্রের এক মহত্তম উপাখ্যান। ভোট নামক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও বলা যায় ভোটপর্বের মধ্য দিয়ে আশু শাসক নির্বাচন করাটা মোটেই গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠার পরিচয় নয়। কী উৎপাদন হবে, কতটা উৎপাদন হবে, কীভাবে উৎপাদন হবে, প্রয়োজনীয় রসদ সমূহের কীভাবে সংস্থান হবে, উৎপন্নসমূহ কীভাবে বন্টন করা হবে, উৎপাদন ও বন্টনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়সমূহকে উৎপাদক-তথা-সমাজের গণতান্ত্রিক এক্তিয়ারে এবং নিয়ন্ত্রণের কোনো সুচারু ব্যবস্থা ছাড়া সবচেয়ে কার্যকর গণতন্ত্র যে খর্ব ও খণ্ডিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, আমরা আগেই যেমন দেখিয়েছি, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন স্তম্ভসমূহ কীভাবে পুঁজির দিকে সব সময়ে হেলে থাকে। তাছাড়া ইতিমধ্যে ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন উঠে গেছে — লাভ ও লোভের যথেচ্ছ তাড়নায় আমাদের একমাত্র বাসযোগ্য প্রিয় এই ধরিত্রীর পরিবেশ যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, চলতি গণতন্ত্রে তা প্রতিরোধে কোনো দাওয়াই বা রক্ষাকবচ নেই কেন? সবচেয়ে বড়ো কথা, অসাম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র, জীবন-জীবিকার অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা পীড়িত এবং যুদ্ধ ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাতে নিদারুণ অপচয়ের এই পৃথিবীতে কি গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব?

পুঁজিবাদী সমাজে বিদ্যমান গণতন্ত্রের এই খামতিকে বুর্জোয়া শ্রেণির স্তাবক ও পৃষ্ঠপোষকরা আড়াল করেন ও করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কেননা গণতন্ত্রের স্বীকৃত ধারণা ও অনুশীলনের মহত্ত্বের জয়গান গেয়েই তারা পুঁজির শোষণ ও বুর্জোয়া শাসনকে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়ে চলেছেন। আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, গণতন্ত্রের এই বুজরুকিটা তারা হিসেব কষে অথবা চক্রান্ত করে সমাজের ওপর নামিয়ে আনেনি বা চাপিয়ে দেয়নি। আর্থ-সামাজিক বিকাশের একটা পর্বে সমাজে গণতন্ত্রের একটা চাহিদা অনুভূত হয়, বুর্জোয়াদের একটা অংশ সহ সমগ্র নিপীড়িত সমাজ সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হয়; আবার, দেশে দেশে নিপীড়িত জনগণের বিদ্রোহে আতঙ্কিত বুর্জোয়া শ্রেণির একটা অংশ গণতন্ত্রের জন্য এই বিদ্রোহ-বিপ্লবে দোদুল্যমানতা দেখায়, কোথাও বা বিরোধিতায় সামিল হয়। এইসব দোলাচল সত্ত্বেও এবং দোলাচল নিয়েই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যখন বাস্তবের মাটিতে জায়গা করে নেয়, তখন বুর্জোয়া শ্রেণি তার নিজ শাসনের নিশ্চয়তা আদায় করে নেয়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণি-শাসনের আদর্শ রূপ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সেই
বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণি-শাসনের আদর্শ রূপ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সেই
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ তাকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেনে নিতে হয়, কখনো তা আবাহন করতে হয়; কিন্তু সেই দিকেই ফিরে যেতে তার শ্রেণি-প্রবৃত্তি তাকে বারবার প্রণোদিত করে — গত দুই শতাব্দীর ইতিহাসের এটাই শিক্ষা।

কিন্তু এই গণতন্ত্রের প্রতি কম্যুনিস্টদের মূল্যায়ন বা ভূমিকা কী? আমরা দেখব 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশের পর দেড়শো বছরের মধ্যে গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিস্টদের, বলা ভালো আধিপত্যকারী কম্যুনিস্টদের ধারণার কী নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে।

আগেই বলেছি, ওই কম্যুনিস্টদের কাছে গণতন্ত্র হল বুর্জোয়াদের বুজরুকি ও কারসাজি আর কম্যুনিস্টদের জন্য বিপরীত আদর্শ অনুশীলন হল 'সর্বহারা একনায়ত্ব', যেখানে গণতন্ত্রের কোনো পরিসর নেই। আলোচনা শুরু করি কম্যুনিসট ম্যানিফেস্টো-র 'প্রলেতারিয়েত ও কম্যুনিস্টরা' শীর্ষক অধ্যায়ের একটা অনুচ্ছেদ দিয়ে — '...শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণির অবস্থানে উন্নীত করা। **গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া**'। (জোর বসানো লেখকের) লক্ষ্য করার বিষয়, মার্কস-এঙ্গেলসের আদি ভাষ্যে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের প্রথম ধাপ হল শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আর সেটাই দাঁড়াচ্ছে গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়ার সহঘটনা। অর্থাৎ বিষয়টা এরকম নয় যে, শ্রমিক একনায়ত্ব গণতন্ত্রবর্জিত একটি ব্যবস্থা, বরং ও দুটি পরস্পর পরিপূরক ধারণা ও অনুশীলন। আমরা এনিয়ে পরে আলোচনায় আসছি। তার আগে পুঁজিবাদী সমাজে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব কি শুধুই লোকঠকানো কারসাজি অথবা বিভ্রম, না-কি সেই গণতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণির কিছু পাওয়ার আছে, তা নিয়ে সামান্য হলেও আলোচনা জরুরি।

চলতি গণতন্ত্রের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দেখায় এই গণতন্ত্র শেষ বিচারে যতই বুর্জোয়া শাসনের মঞ্চ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিনিয়ত পুনরুৎপাদিত করুক, এই গণতন্ত্রেই অঙ্গীভূত থাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা। এটা বুর্জোয়া শ্রেণি দয়া করে দেয় না, আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া, এই স্বাধীনতাগুলো না থাকলে বুর্জোয়া শ্রেণির বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ইতর কামড়াকামড়ি করার সুযোগটা পেত না; পলিসি নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেত না; আর এসব নিয়েই সম্মিলিত শ্রেণি-শাসনের মঞ্চটা গড়ার ও চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত না। এগুলোর কোনোটাই মরীচিকা অথবা মিথ্যা নয়, বরং জলজ্যান্ত সত্য। এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অধিকার কেড়ে নেবার সংস্থান সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধানেও মজুত থাকে — এটা যেমন সত্য, তেমন এটাও সত্য যে সাধারণ অবস্থা, প্রাত্যহিক জীবনে ওই সমস্ত অধিকারের সুবাদে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরোধী পক্ষ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণি এবং নিপীড়িত জনগণ মতামত সংগঠিত করার, সংগঠিত হওয়ার সবচেয়ে প্রশস্ত সুযোগ পায়। যদিও এক্ষেত্রেও টাকার থলি সব সময়ে এই সুযোগকে বুর্জোয়া ও ধনীদের অনুকূলে, শ্রমিক ও গরিবদের প্রতিকূলে কাজ করার মদত জোগায়।

চলতি গণতন্ত্রকে স্রেফ বুর্জোয়া বিশেষণে গালমন্দ দিয়ে কম্যুনিস্টরা সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত থাকতে পারে না। তার ইতিবাচক পরিসর এবং নেতিবাচক সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করে তার দায়িত্ব গণতন্ত্রের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সেই সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া। চিরায়ত মার্কসবাদ গণতন্ত্রের ধারণা ও অনুশীলনকে শুধু স্বাগতই জানায়নি, পাশাপাশি তার দুর্বলতা, একপেশেপনা ও নোংরামিকে অনুধাবন করে তার উত্তরণের সন্ধান করেছে।

তাই আমরা দেখতে পেলাম ১৮৭১ সালে প্যারি কম্যুনের মধ্য দিয়ে সর্বহারা রাষ্ট্রের যে রূপ শ্রমিক শ্রেণি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করল এবং মার্কস-এঙ্গেলস দু-হাত তুলে তাকে স্বাগত জানাল, তা গণতন্ত্রকে এক নতুন ব্যঞ্জনা প্রদান করল। কী আশ্চর্য! যে যে কারণে প্রচলিত গণতন্ত্র চালু থেকেও অধরা থেকে যায়, খর্ব ও খণ্ডিতভাবে প্রযুক্ত হয়, শ্রেণি-সচেতন কম্যুনার্ডরা তার অনেকগুলোকেই আঘাত করল এবং বিকল্প ব্যবস্থা চালু করল। লক্ষণীয়, গণতন্ত্রের বুর্জোয়া অন্তর্বস্তুকে নাকচ করতে গিয়ে তারা গণতন্ত্রকে নাকচ করল না, বরং তাতে গুণগতভাবে ভিন্ন মাত্রা যোগ করল, তার এক উত্তরণ ঘটালো। এক ঝটকায় তারা স্থায়ী সেনাবাহিনীর বিলোপসাধন করে গণতন্ত্রের ওপর স্বৈরাচারের সদা-উপস্থিতিকে নস্যাৎ করল; যে কর্মকর্তারা (আমলাতন্ত্র হিসাবে) নির্বাচনের এক্তিয়ারের বাইরে থাকে, তাদের করে তুলল নির্বাচিত এবং যে-কোনো সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য; শুধু তা-ই নয় উচ্চ বেতনলাভের সুযোগে সেই কর্মকর্তারা যেভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে কাজ করত, তাদের বেতন গড় শ্রমিকদের সমান করে দিয়ে সেই স্বাভাবিক সখ্যতার মূল উপাটিত করল; বিচারবিভাগকেও তারা আনল নির্বাচন ও নজরদারির আওতায়। গণতন্ত্রবিরোধী এবং একনায়কত্ব-র নব্যপূজারী কম্যুনিস্টরা কি এগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র বর্জন অথবা হানির বৈশিষ্ট্য

একনায়কত্ব-র নব্যপূজারী কম্যুনিস্টরা কি এগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র বর্জন অথবা হানির বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছেন? আসলে এই কম্যুনিস্টরা শ্রেণি একনায়কত্বর সঙ্গে শ্রেণি গণতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্ক বুঝতেই ব্যর্থ হচ্ছেন। কী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের ক্ষেত্রে, কী তা সফলভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতালাভের আগে ও পরে গণতন্ত্রের পরিসরের গুরুত্বকে বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কবে থেকে এবং কেমন করে কম্যুনিস্ট শিবিরে এই উলটো যাত্রা শুরু হল, তা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে, আজ যেভাবে গণতন্ত্র ও কম্যুনিজম বিপরীত ধারণা ও অনুশীলন হিসাবে একদিকে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্যতা এবং অপরদিকে জনবিরূপতা অর্জন করেছে, তাতে তা নিয়ে সাহস করে চর্চা করতেই হবে। আসলে একনায়কত্বের হাত ধরে গণতন্ত্রকে বর্জন করে একের পর এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর তথাকথিত সাফল্যই এই তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। শুরু থেকেই শুরু করা যাক। রুশ বিপ্লবের উদাহরণই এ বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে ভালোভাবে আলোকপাত করতে পারে।

আমরা জানি রাশিয়া ছিল একটি পিছিয়ে-থাকা পুঁজিবাদী দেশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হলেও তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপাদান যথেষ্ট দুর্বল ছিল। এই অবস্থায় রাশিয়ার বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণি, বিশেষত তার আগুয়ান অংশ বিশ্ব বিপ্লব, বিশেষত বিকাশমান জার্মান বিপ্লব এবং ইয়োরোপের দেশে দেশে শ্রমিক বিদ্রোহের ওপর অনেক আশাভরসা নিয়ে তাকিয়ে ছিল। সম্ভাবনা দেখা দিলেও বাস্তবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ঘটল না। রুশ বিপ্লব বিচ্ছিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হল। এদিকে বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং মহামারীর মধ্য দিয়ে শুধু যে শ্রমিক বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তা-ই নয়, তার সবচেয়ে দৃঢ়চেতা ও আগুয়ান অংশ শারীরিকভাবে শেষ হয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এহেন বিষম ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এক কেজো সমাধান হাজির করা হয়। আপাতত পিছিয়ে আসা যাক। শ্রমিক-ক্ষমতাকে পার্টি-ক্ষমতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হোক; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির চিন্তাশীল অংশ এবং পার্টি-কর্মীদের মধ্যে, বিভিন্ন পার্টির মধ্যে বিতর্ক বন্ধ করা হোক, তার বদলে অনুসরণ করা হোক পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মহাজ্ঞানী পথ নির্দেশ। গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ সঙ্কুচিত হল, অন্যান্য সমস্ত পার্টি কার্যত নিষিদ্ধ করা হল। চালু হল, এক পার্টি, এক মত, এক নেতা, এক পথ। শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বকে কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কত্বর সমার্থক করে নেওয়া হল। স্বাভাবিকভাবেই তা পার্টি একনায়কত্বে থেমে থাকল না, সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তা পর্যবসিত হল প্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটির একনায়কত্বে, পরে এক ক্ষুদ্র ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর একনায়কত্বে, সব শেষে সমস্ত বিতর্কের ঊর্দ্ধে সর্বশক্তিমান মহান এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে। এইভাবে শুধু যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 'কর্তা'র ভূমিকা থেকে শ্রমিক শ্রেণি অপসৃত হল, তা-ই নয় রাজনৈতিক জীবন ও প্রক্রিয়া থেকে গণতন্ত্রকে বর্জন করা হল।

এই তথাকথিত 'পেছিয়ে আসা' শুধু জীবন্ত কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ রইল না। তাকে তাত্ত্বিক মর্যাদা দেওয়া হল, যার পরিণাম ও অভিশাপ একশো বছর পরেও আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে।

যে লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ঘোষণা করেছিলেন : 'আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে হবে, জনগণের সৃজনশীলতার প্রতি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।... জীবন্ত, সৃজনশীল সমাজতন্ত্র জনগণের নিজের কর্মকাণ্ডের ফল।... ভুলভ্রান্তি হোক ... সেগুলো হবে নতুন জীবনের ধরণ সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল একটা নতুন শ্রেণির ভুলভ্রান্তি।...' (সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড ২৬, পৃঃ ২৬১, ২৮৮, ৩৬৫) — সেই লেনিনই ১৯১৯ সালে জোরালোভাবে সওয়াল করলেন : 'শ্রমিক শ্রেণি একনায়কত্ব বলশেভিক পার্টির মাধ্যমে প্রযুক্ত হচ্ছে, যে পার্টি সেই ১৯০৫ সালে এবং এমনকি তার আগেও সমগ্র বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।' (পরোক্ষ সূত্র : লেনিন ১৯১৭-১৮২৩, টনি ক্লিফ, পৃঃ ১৭৪)

যে ট্রটস্কি প্রতিস্থাপনার উপাদান ও সম্ভাবনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ট্রটস্কি ওয়ার্কার্স অপোজিসন-এর বিরুদ্ধে কলম ধরে মন্তব্য করলেন : 'তারা ... শ্রমিকদের অধিকারকে পার্টির ঊর্দ্ধে স্থান দিয়েছে এমনভাবে যেন পার্টির পক্ষ থেকে তার একনায়কত্ব জাহির করার কোনো অধিকার নেই... আমাদের পার্টির বিপ্লবী ঐতিহাসিক জন্মাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত, এটা খুবই জরুরি। অসংগঠিত জনগণের, এমনকি শ্রমিক শ্রেণির সাময়িক দোদুল্যমানতায় অনপেক্ষভাবে নিজের একনায়কত্ব রক্ষা করতে পার্টি দায়িত্ববদ্ধ।' (জোর বর্তমান লেখকের) (পরোক্ষ সূত্র : ট্রটস্কি ১৯১৭-১৯২৩, টনি ক্লিফ, পৃঃ ১৭৪)

কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা কামেনভ ঘোষণা করলেন : 'কম্যুনিস্ট পার্টি হচ্ছে রাশিয়ার সরকার। ৬ লাখ পার্টি সদস্য দ্বারা দেশটা চালিত হচ্ছে।' (স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ।) (পরোক্ষ সূত্র : লেনিন ১৯১৭-১৯২৩, টনি ক্লিফ, ১৭৫)

আর এক নেতা জিনোয়িভ দাবি করলেন : 'কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিই হল সোভিয়েতসমূহের, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের এবং সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কমিটি। ... এটা শ্রমিক শ্রেণিরও কেন্দ্রীয় কমিটি।...' (বাস্তব অবস্থার বাস্তব স্বীকৃতি।) (পরোক্ষ সূত্র : লেনিন ১৯১৭-১৯২৩, টনি ক্লিফ, ১৭৫)

প্রসঙ্গত ওয়ার্কার্স অপোজিশন গঠিত হয়েছিল বলশেভিক পার্টির একটা ফ্রাকশন হিসাবে, যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু শ্রমিকদের অগ্রণী অংশ সংগঠিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্র গড়ার নামে যেভাবে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে, বিশেষত এক-ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার অধীনে উৎপাদন সংগঠিত হচ্ছিল এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অধিকার থেকে শ্রমিক শ্রেণিকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল ওয়ার্কার্স অপোজিশন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই পর্বে জার্মানির জেলে বসে যতটুকু খবর পাচ্ছিলেন, তার ভিত্তিতে রোজা লুক্সেমবার্গ রুশ বিপ্লবের গতিপথ ও সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ককরেছিলেন এবং যেভাবে বিজয়ী পার্টির পক্ষ থেকে প্রলেতারীয়-গণতন্ত্র বিরুদ্ধ কাজকর্মকে তাত্ত্বিক মর্যাদা দান করা হচ্ছিল, সে-সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। (আগ্রহী পাঠক তাঁর লেখা The Russian Revolution পড়েনিতে পারেন) প্যারি কম্যুন সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেলসের মূল্যায়ন, লেনিন এবং ট্রটস্কির আগেকার মতামত, তার পাশাপাশি সেই বিক্ষুব্ধ সময়ে ওয়ার্কার্স অপোজিশন-এর মতো চিন্তাশীল ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ও পার্টি কর্মীদের একাংশের বিদ্রোহ, লুক্সেমবার্গের হুঁশিয়ারি অন্তত এটা প্রমাণ করে যে, সর্বহারা একনায়কত্ব পর্বটাকে যেভাবে পরবর্তীকালে গণতন্ত্রহীন এক পাথুরে পার্টি একনায়কত্বের জমানা হিসাবে উত্থাপন ও স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছিল, সেটা সব সময়ে সকলের কাছে গ্রাহ্য ও স্বীকৃত ছিল না।

যাই হোক, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কারিগর হিসাবে শ্রমিক শ্রেণি মঞ্চে আবির্ভূত হলেও বিপ্লবটা চালিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হল। অন্য দিকে কম্যুনিস্ট পার্টি যেন শ্রমিক শ্রেণির হয়ে সেই কর্তব্য সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করল। অন্যভাবে বললে রাশিয়ায় প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মাঝপথে পরিত্যক্ত হল, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল বটে, তবে তা সমাজতন্ত্রে অন্য কিছুতে উপনীত হল। উৎপাদন উপকরণ থেকে উৎপাদক — তথা শ্রমিকরা আগের মতোই বঞ্চিত রইল, সেই অর্থে তারা সর্বহারাই রয়ে গেল, মজুরি-দাসত্বের জোয়াল থেকে তাদের মুক্তি ঘটল না; আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার শরিক হয়ে 'সঞ্চয়নের জন্য সঞ্চয়ন'-ই হয়ে রইল উৎপাদনের প্রেরণা। এসবের অনুষঙ্গী হিসাবে যখন সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার জয়ডঙ্কা বেজে উঠল, তখন রাষ্ট্র শুধু টিকে থাকল না, ফুলেফলে পল্লবিত হয়ে উঠল, তা নিউক্লিয়ার বোমা সহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল। এইভাবে রুশ শ্রমিক শ্রেণির পরাজয় ঘটল, আর ইতিহাসের কী করুণ পরিণতি, শাসক কম্যুনিস্ট পক্ষ এই পরাজয়কে জয় হিসাবে চিত্রিত করল এবং জয়ী পক্ষ সেরকমভাবেই ইতিহাস ও তত্ত্ব রচনা করল। সমাজতন্ত্রের নতুন পথের তত্ত্বায়ন হল; একের পর এক দেশে শ্রমিক শ্রেণির সক্রিয়তা ও শ্রমিক বিপ্লব ছাড়াই সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হল। দুনিয়ার এক বিশাল অংশ লালে লাল হয়ে উঠল। আবিষ্কৃত ও প্রযুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই জয়যাত্রায় উৎক্রমণশীল পর্বে গণতন্ত্রের অনুশীলন, শ্রমিক শ্রেণির সক্রিয়তা ও আত্মমুক্তির প্রেরণা ও প্রয়াস অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা জ্ঞানে পরিত্যাজ্য হল। সবার ওপরে সত্য হল পার্টি। সত্য হল সঠিক লাইন, সত্য হল পার্টির একনায়কত্ব।

(দুঃখের বিষয়, পার্টি একনায়কত্বশোভিত গণতন্ত্র বিরুদ্ধ শ্রমিক-বিরোধী এই পথকে যাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই সমালোচনা করলেন, তাদের একটা অংশ এই যাত্রাপথের স্বৈরাচারের বীভৎসতা দেখে কম্যুনিজম থেকে, মার্কসবাদী দিশা থেকেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। বিজয়ী পক্ষ যতই প্রচার করুক, তারাই মার্কসবাদের ধারাবাহিকতা, তারাই কম্যুনিজমের ধারক, এটা ইতিহাস নয়। সমাজ বদলের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, এমন আগ্রহী অনুসন্ধিৎসু কর্মীরা দেখতে পাবেন একটা বিক্ষুব্ধ ধারা, একটা ভিন্ন ধারা কম্যুনিজমের ভিন্ন পথের, গণতান্ত্রিক সন্ধান করে চলেছেন।)

আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের মূল আলোচনায়। কী চলতি পুঁজিবাদী সমাজে, কী পুঁজিবাদ থেকে কম্যুনিজমের উৎক্রমণশীল পর্বে গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিস্টদের মনোভাব কী? একথা জোর দিয়ে বলা যায়, রুশ বিপ্লবের তথাকথিত বিজয়ের (যা প্রকৃত অর্থে, শ্রমিক বিচারে পরাজয়) আগে পর্যন্ত মার্কসবাদী শিবিরে স্বীকৃত ধারণা আর তার পরের আধিপত্যকারী ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। চলতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জমানায় তার বুর্জোয়া চরিত্রের ওপর একপেশে ও যান্ত্রিকভাবে জোর দিয়ে তার শক্তিকে তারা অবমূল্যায়ন ঘটান

এবং তার ফলশ্রুতিতে তাকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করা ও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। সত্যি কথা বলতে কী, আজ পর্যন্ত কম্যুনিস্টদের তথাকথিত সাফল্যের বেশিরভাগটাই দেখা গেছে কোনো ঔপনিবেশিক দেশে অথবা স্বৈরাচারী রাষ্ট্রসম্পন্ন দেশে; তুলনায় একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জমানায় কম্যুনিস্টদের সেরকম সাফল্য নেই। একদিকে, ওই ধরণের দেশে তাদের সফল অনুশীলনের ঘাটতি যেমন গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি টিকিয়ে রাখতে ও/বা বাড়াতে সাহায্য করেছে, তেমনই গণতন্ত্র বিষয়ক তাত্ত্বিক দুর্বলতা তাদের অনুশীলনকে দুর্বল ও বিপথগামী করেছে।

এসবের উপরি-ফল হল — কম্যুনিস্টদের একটা অংশ পার্লামেন্টকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তাতে বিলীন হয়ে গেছে, আর একদল পার্লামেন্টকে বয়কট করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে নিজেদের কাজকর্মকে প্রান্তিক সীমায় সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

এই যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম বিকাশের ক্ষেত্রে উপযোগী মঞ্চ প্রদান করেছে, তার প্রতি কোনো মোহ না রেখেই তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি সংগ্রাম বিকাশ করা যায়, তার মধ্য দিয়ে পরিণত ও সচেতন শ্রমিক শ্রেণি কীভাবে পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস সাধন করে নিজ শ্রেণি-শাসনের উপযোগী মঞ্চ গড়ে তুলতে পারে, সে-সম্বন্ধে তারা খুব কম ধারণাই দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, ওই শ্রেণি শাসন যে শুধু সর্বহারা একনায়কত্বে মূর্ত হয়ে উঠবে না, তাকে যুগপৎ সর্বহারা গণতন্ত্রকে ধারণ করতে হবে, এটা তাদের লক্ষ্য হিসাবেই বিবেচিত হয় না। শাসক শ্রেণি স্তরে উন্নীত হওয়া যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা মাত্র, তা-ই ইতিকর্তব্য নয়, এটা তাদের চিন্তা চেতনায় হারিয়ে গেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয়টা তাদের মাথাতেই নেই, তা হল — উৎক্রমণশীল পর্বে কীভাবে পথ কেটে বেরোতে হবে, সেটার কোনো ফর্মুলা নেই, কোনো সঠিক লাইন নেই, তা কোনো টেক্সবুকে লেখা নেই; ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিপ্লবী শ্রেণির সামনে পথ চলার শুধু কয়েকটি আলোকস্তম্ভই থাকতে পারে, বাকিটা পড়ে রয়েছে ভবিষ্যত কুয়াশার গর্ভে। তাই যে শ্রেণিটির সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনটি ঘটবে, গণতন্ত্রকে অবশ্যই তার উপজীব্য হতে হবে। তাই সর্বহারা একনায়কত্বের যুগপৎ ধারণা ও অনুশীলন হল সর্বহারা গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র বাদ দিলে আর যাই হোক, সমাজতন্ত্রে কোনো দিন উপনীত হওয়া যাবে না। পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যতই মহান, গৌরবময়, নির্ভুল হোক না কেন, তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণব্রতে যতই মথিত হোক না কেন, পার্টি একনায়কত্বের মঞ্চ দিয়ে ওপর থেকে পথ প্রদর্শন করার ওপর নির্ভর করলে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদরই গড়ে উঠবে। শেষ করার আগে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে একটা বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সর্বহারা গণতন্ত্রের পথ ধরে যখন সমগ্র সমাজের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম সম্ভব হবে, যখন সমাজের মৌলিক অসাম্যের অবসান হবে, তখন শুধু রাষ্ট্রেরই নয়, রাষ্ট্রীয় ধারণা হিসাবে গণতন্ত্রেরও অবসান হবে। তখন গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক চরিত্রের অবসান শেষে গণতন্ত্রের নতুন উত্তরণ ঘটবে, গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনা পাবে, হয়তো সেই নতুন সংস্কৃতিসম্পন্ন গণতন্ত্র নিজেকে পরিচিত করাতে নতুন পরিভাষার জন্ম দেবে।

সুতরাং, পুঁজিবাদী জমানায় যেমন গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে, তাকে রক্ষা ও সম্প্রসারণ করতে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সেই গণতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণিসংগ্রামের সর্বোচ্চ বিকাশের জন্য সচেষ্ট হতে হবে — তেমনই সর্বহারা শ্রেণি যখন নিজ ক্ষমতা কায়েম করবে, তখন গুণগতভাবে ভিন্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তাকে ব্যবহার করতে হবে ভিন্ন উন্নততর সমাজ গড়ে তোলার কাজে।

ইতিহাসের ট্র্যাজেডি হল — রাশিয়া, পূর্বইয়োরোপের দেশে দেশে, চীনে, ভিয়েতনামে, কাম্পুচিয়াতে, আলবেনিয়াতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নামে যে গণতন্ত্রবিরুদ্ধ রাষ্ট্র কায়েম হল, যে গণতন্ত্রবিরুদ্ধ অনুশীলন করা হল, তাতে কম্যুনিজম এবং মার্কসবাদ পরিচিত হল এক গণতন্ত্রবিরুদ্ধ মতবাদ ও ভাবনা হিসাবে। সমাজতান্ত্রিক দুর্গের একের পর এক পতনের পর বুর্জোয়া দুনিয়া যখন উল্লাসে ফেটে পড়েছে, তখন আশার কথা একটাই — এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত ও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে-থাকা বহু ধারণা জিজ্ঞাসার মুখে পড়েছে, বোঝা গেছে যে বহু সমাধিত প্রশ্ন আজও অসমাধিত। আজ সময় এসেছে চিরায়ত মার্কসবাদকে পুনরুদ্ধার করার এবং তাতে নতুন ও যুগোপযোগীভাবে প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করার। তত্ত্বগতভাবে ও অনুশীলনে গণতন্ত্রের সংঘর্ষ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাতে হবে।

এইভাবে এই চণ্ডীচরণ দাসই ভারতে প্রথম অফসেট মেশিন আমদানি করেন। সময় ১৯২৮ সাল। প্রিন্টিং ব্যবসায়ে রত অনেকেই ভাবলেন, এবার হয়তো তাঁদের আসন টলে যাবে। ছাপাখানার শিল্পে কেল্লাফতে করে যাবেন বুঝি চণ্ডীচরণ দাস একাই।

কিন্তু তা হল না। খুঁতখুঁতে স্বভাবের উচ্চাকাঙ্খী চণ্ডীচরণ দাস ক্রমে দোলাচলে আক্রান্ত হলেন যেন। তাঁর তখন নজর পড়েছে লিথো গ্রাফির দিকে। ১৯৩২ সনের মাঝামাঝি সময়ে 'ফাইন আর্ট কটেজ'কে একরকম লিকুইডেশনে তুলে দিলেন চণ্ডীচরণ। ততদিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর উপযুক্ত ছেলে হৃষীকেশ দাস। ১৯৩৩ সনে পিতা-পুত্রের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হল 'ঈগল লিথোগ্রাফি' কোম্পানি — যে কোম্পানির বিপুল প্রতিষ্ঠা ও বৈভব উপভোগ করতে করতে ১৯৪৩-এর ২৫ জুলাই চিরতরে চোখ বন্ধ করলেন বিত্তবান উদ্যোমী বঙ্গরত্ন চণ্ডীচরণ দাস। ২৫.৭.২০১৫

গ্রন্থপঞ্জী :

1. Collected Works/V.I. Lenin/Progressive Publishers/Moscow.
2. Troksky (2); 1917-1923/The Sword of the Revolution/Tony Cliff/Bookmarks/London.
3. Lenin : 1917-1923 /Revolution Besieged/Tony Cliff /Bookmarks/London.

সৌজন্যে : "পুরোগামী"